আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক জীবনধারার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হযরত নূর কুতুবুল আলম মোহাম্মদ আবদুল ক্বাহহার

খ্রিস্টাব্দ ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দশকে (১২০৪ খ্রি.) বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের ফলে লক্ষণাবতী হয়ে ওঠে মুসলিম রাজশক্তির প্রাণকেন্দ্র। সমগ্র গৌড়, পান্ডুয়া ও তৎসংলগ্ন প্রাচীন মালদহ, টান্ডা ও কতিপয় স্থানকে লক্ষণাবতী বলে গণ্য করা হতো। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে বাংলার রাজধানী লক্ষণাবতীতে আগমন করেন অসংখ্য দেশি-বিদেশি সুফি-দরবেশ; তারা মানুষের সেবা করতেন, ইসলামের দাওয়াত দিতেন। সময় পরিক্রমায় তাঁদের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন খানকাহ, মাদ্রাসা, মসজিদ ও দাতব্য চিকিৎসালয়। সুফি-দরবেশদের মানবিক চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক শক্তির ফলে তৎকালীন বাংলার মুসলিম সমাজে ইসলামিক স্কলার ও মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের প্রভাব বিস্তার হতে থাকে। সুলতানি আমলের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার মুসলিম সমাজ যখন নিদারুণ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংকটের সম্মুখীন, তখন যিনি সংকট মোকাবেলায় মুসলিম সমাজকে দিশা দিয়েছেন, তিনি হযরত শায়খ নূর কুতুবুল আলম (রহ.)।

"নূর কুতবুল আলম বাংলাদেশের সেকালের রাজধানী পান্ডুয়ায় জন্মগ্রহণ করনে। তাঁর প্রকৃত নাম নূরুদ্দীন নূরুল হক। কিন্তু জনসাধারণের নিকট তিনি 'নূর কুতবুল আলম' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার উত্তর-পশ্চিম এবং ভারতের পশ্চিম বাংলার মালদহ শহরের মাত্র দু'মাইল দক্ষিণে সুলতানী শাসকদের রাজধানী শহরের পান্ডুয়ায় খুব সম্ভব ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, 'আইন-ই-আকবরী' অনুসারে তাঁর জন্ম হয় পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী লাহোরে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই মহাসাধকের বহির্বাংলায় জন্ম গ্রহণের কোন হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। ইলিয়াস শাহী সুলতানদের সঙ্গে তার বংশের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। তাই তাঁর সঠিক জন্ম-তারিখ ও সন ইতিহাসে উল্লেখ না থাকলেও গৌড় সাম্রাজ্যের ইলিয়াস শাহী রাজবংশের তৃতীয় ন্যায়পরায়ণ ও সুপ্রসিদ্ধ শাসক গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ (১৩৯০-১৪১০ খ্রী.) সম-সাময়িক ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, নূর কুতবুল আলম ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।"[১]

হযরত নূর কুতুবুল আলমের পিতার নাম হযরত শায়খ আলাউদ্দীন আলাউল হক। তিনিও বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ও সুফি ছিলেন। হযরত শায়খ আলাউদ্দীন আলাউল হক ছিলেন দিল্লি শায়খ খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়ার অন্যতম খলিফা শায়খ আঁখি সিরাজ উদ্দীনের সর্বাধিক খ্যাতনামা শাগরেদ ও খলিফা। নূর কুতুবুল আলমের দাদা শায়খ উমার ইবনে আসআদ খালিদী ছিলেন গৌড়ের সুলতান সিকান্দার শাহের কোষাধ্যক্ষ।

মায়ারিফ আলওয়ায়েত গ্রন্থমতে, তার পরিবার বিখ্যাত কুরাইশ বংশীয় সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের বংশধর।[২] নূর কুতুবুল আলমের বড় ভাই শায়খ আযম খান ছিলেন পান্ডুয়ার রাজদরবারের উজির। অতএব দেখা যায়, বংশানুক্রমিকভাবেই নূর কুতুবুল আলমের পরিবারের সাথে রাজদরবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। পিতার ন্যায় নূর কুতুবুল আলমও ছিলেন ধর্মতত্ত্বে সুপণ্ডিত। তিনি সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের সহপাঠী ছিলেন এবং তারা উভয়েই বীরভূমের বিখ্যাত আলেম ও দরবেশ কাজী হামিদ উদ্দীন কুঞ্জনশী নাগোরীর (১২৫৬-১৩৬০ খ্রি.) নিকট শিক্ষালাভ করেন। নূর কুতুবুল আলমের খলিফা হুসাম উদ্দীন মানিকপুরীর মালফুজাত *রফিকুল আরেফীন* থেকে জানা যায়, তার পীর (কুতুবুল আলম) ও গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের মধ্যে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।[৩]

আলেম ও সাধক পিতা শায়খ আলাউল হকের পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বাবধানেই বাল্যকাল থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার তালিম চলতে থাকে। পিতার নির্দেশে তিনি কঠোর সাধনার জীবন বেছে নেন। পিতার খানকাহ ও তৎসংলগ্ন লঙ্গরখানা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত

---

১. *শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা, শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী ও নূর কুতুবুল আলম (র.) : সাধকত্রয়ের জীবন ও কর্মের উপর তুলনামূলক সমীক্ষা* : মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, ঢাকা, ২০০১, ২৩৯–২৪০ পৃ.

২. *আখবারুল আখিয়ার* : আব্দুল হক দেহলভী, দিল্লি, ১৯১৩, ৫২ পৃ.

৩. আব্দুল লতিফ, প্রাগুক্ত, ২৪৬ পৃ.

হয়। এ দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে কঠোর কায়িক পরিশ্রম করতে হতো। ফকির, ভিখারি, মুসাফিরগণের কাপড় ধোয়া, তাদের ওজু ও গোসলের জন্য পানি গরম করা, খানকাহের মেঝে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা থেকে শুরু করে খানকাহের শৌচাগার পরিষ্কারের কাজও তাকে করতে হয়েছে। এমনকি, রান্নার জ্বালানির জন্য দূরের বন থেকে কাঠ সংগ্রহ ও বহন করে নিয়ে আসতেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা প্রচলিত আছে। একদিন জ্বালানি কাঠের বোঝা মাথায় বহন করে তিনি যখন শহরে আসছিলেন, তখন পথিমধ্যে বড় ভাই আযম খানের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়ে যায়। আযম খান তখন ছিলেন সুলতানের উজির। ছোট ভাই নূর কুতুবুল আলমকে তিনি এহেন কাজ ত্যাগ করে তাঁর অধীনে সরকারি দফতরের কোনো উঁচুদরের কাজ গ্রহণ করার কথা বলেন, কিন্তু বড় ভাইয়ের প্রস্তাব তিনি নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেন। ড. মুহাম্মদ এনামুল হক তাঁর *A History of Sufism in Bengal* নামক গ্রন্থে ঘটনাটি তুলে ধরেছেন এভাবে– "On the authority of Rafiqul Arifin, Tadhkirah relates that while he (Nur-Kutubul Alam) was carrying on his head a bundle of faggots for the use of the guest house (Langar Khanah), he met by chance with his elder brother Azam Khan, who exclaimed, "How long will carry faggots, o Nuruddin! Living with father, you have only experienced of carrying woods: once come to me so that I may make you independent of all this." On hearing this, Nuruddin replied, I have no necessity of your wealth and grandeur which are perishable. To carry faggots for the monestary is better (than wealth), the post of dignitaries is for you."[4]

তাঁর পিতা একবার তাকে বললেন, যেখানে মহিলারা পানি তোলে, সেখানটা বড় পিচ্ছিল বিধায় অনেকে পড়ে যায় এবং কলসী ভেঙ্গে যায়। তুমি তাদের ভরা কলসী ঘাড়ে করে শুকনো জায়গায় এনে দিবে। পিতার আদেশমত তিনি চার বৎসর মেয়েদের কলসী বয়েছেন। এজন্য অনেকে তাঁকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে ছাড়ত না। কিন্তু তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না।[৫]

এভাবেই মানবসেবা, নির্লোভ জীবনাদর্শ ও আল্লাহ তাআলার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে হযরত নূর কুতুবুল আলম আধ্যাত্মিক জীবনে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন এবং পিতার যোগ্য আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীরূপে পরিগণিত হন। ইসলামি ধর্মতত্ত্বে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং আধ্যাত্মিক সাধনার খ্যাতি বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থান হতে বহু সাধক তার নিকট আসতেন তাসাউফের দীক্ষা লাভ করতে। তাঁর ভাবশিষ্যদের মধ্যে মানিকপুরের হুসাম উদ্দীন (মৃ. ১৪৭৭ খ্রি.), লাহোরের শায়খ কাফু (মৃ. ১৪১৬ খ্রি.), আজমীরের শামসুদ্দীন (মৃ. ১৪৭৬ খ্রি.) এবং আরও অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ পান্ডুয়াতে সমবেত হন। তাঁর পারিবারিক শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন পুত্রদ্বয় রিফাত উদ্দীন ও শায়খ আনোয়ার এবং দৌহিত্র শায়খ যাহিদ। পান্ডুয়াতে তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো একটি মাদ্রাসা, একটি চিকিৎসালয়, একটি খানকাহ ও লঙ্গরখানা। গবেষক বলেন, "সোনারগাঁও-এর শায়খ শরফূদ্দীন আবূ তাওয়ামার মাদ্রাসার ন্যায় পান্ডুয়ায় শায়খ নূর কুতুবুল আলমের এ মাদ্রাসাটিও তদানীন্তন বাংলার মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।"[৬]

বাংলায় মুসলিম শাসনের বিপর্যয় ও কুতুবুল আলমের রাজনৈতিক ভূমিকা

সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ (১৩৯০–১৪১১ খ্রি.) বিহারের বিখ্যাত সুফি মাওলানা মুজাফফর শাহ বলখীকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন এবং শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা-সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বলখী সুলতানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেন মুসলমানদের সাম্রাজ্যে হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ না করা হয়। গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ মাওলানা বলখীর পরামর্শ কতটুকু গ্রহণ করেছিলেন বা আদৌ গ্রহণ করেছিলেন কি-না সে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে পরবর্তী ঘটনাবলি পর্যালোচনা করে বলা যায়, সতর্কতার পেছনে মাওলানার যে আশঙ্কা ছিল তাই বাস্তবায়িত হয়। উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারীরাই পরবর্তী সময়ে ইলিয়াস শাহী বংশের ধ্বংসের নিয়ন্তা হয়ে ওঠে এবং এ কাজে নেতৃত্ব দেন সুলতানের অন্যতম অমাত্য এবং ভাতুরিয়ার জমিদার রাজা গণেশ বা কংস নারায়ণ। এ কথার সমর্থনে অধ্যাপক হাসান আসকারী লিখেছেন, "In view of what happened shortly after to the

---

4. *A History of Sufism in Bengal* : Dr. Mohammad Enamul Hoque, Dhaka, 1975, p. 173

৫. *ইসলাম প্রসঙ্গ* : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ঢাকা, ১৯৬৩, ১৬২ পৃ.

৬. *গৌড়ে মুসলিম শাসন ও নূর কুতুব-উল-আলম* : মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯১, ৩৭ পৃ.

Ilyas Shahi dynasty at the hands of Hindu Minister , Raja Kans or Ganesh, the warning given by the saint of Bihar to Ghyyasuddin Azam Shah appears to be rather prophetic."[7]

রাজা গণেশ মূলত কে ছিলেন? রাজশাহী জেলার ভাতুরিয়া ও দিনাজপুরের হিন্দু জমিদার গণেশ পনের শতকের প্রারম্ভে ইলিয়াসশাহী বংশের দুর্বল সুলতানের নিকট থেকে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে বাংলার রাজা হন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকালের শেষদিকে ইলিয়াসশাহী রাজদরবারে যে-সকল অমাত্য প্রভাবশালী হয়ে ওঠে, গণেশ তাদের অন্যতম। কম করে হলেও চার বছর (১৪১০–১৪১৪) রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা তার হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। সে রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব কুক্ষিগত করে এবং বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগে আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহকে পদচ্যুত (সম্ভবত হত্যা) করে ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসন দখল করে।

সিংহাসনে আরোহণের পর রাজা গণেশ মুসলমানদের উপর ভয়ানক অত্যাচার শুরু করেছিল। বিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থ *রিয়াজুস সালাতীন*'র বর্ণনা অনুসারে, রাজা গণেশ বহুসংখ্যক আলেম ও দরবেশকে হত্যা করে। একদল আলেমকে সে নৌকায় নিয়ে গিয়ে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছে। রাজ্য থেকে ইসলামকে সমূলে উৎপাটিত করাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। পান্ডুয়া অঞ্চলে বিভিন্ন সমাজে একটি কথা প্রচলিত রয়েছে যে, রাজা গণেশ ক্ষমতা লাভের পরে আদিনা মসজিদকে তাঁর কাচারি বাড়িতে পরিণত করেছিল। এ থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, রাজা গণেশের ক্ষমতা লাভ বাংলায় হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সূচনা করে এবং মুসলমানদের ঘোর দুর্দিন শুরু হয়। সুফি-দরবেশরা বাংলার মুসলমানদের এই সংকট থেকে উত্তরণের ব্যাপারে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন; এমনকি, তারা একজন বিদেশি সুলতানকেও বাংলা আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। এ সকল ঘটনা সমসাময়িক সূত্র অর্থাৎ, নূর কুতুবুল আলমের চিঠি দ্বারা সমর্থিত।

এমতাবস্থায় নূর কুতুবুল আলম পার্শ্ববর্তী রাজ্য জৈনপুরের সুলতান ইবরাহিম শার্কীকে গণেশের বিরুদ্ধে বাংলা আক্রমণ করার আহ্বান জানিয়ে চিঠি মারফত লেখেন, "কংস নামক এই দেশের শাসনকর্তা বিধর্মী পৌত্তলিক। সে অত্যাচার ও রক্তপাত করছে। সে বহুসংখ্যক আলেম ও দরবেশকে হত্যা করেছে এবং তাদের ধ্বংস করেছে। এখন অবশিষ্ট মুসলমানদের হত্যা করা ও এদেশ থেকে ইসলামকে নির্মূল করা তার উদ্দেশ্য। যেহেতু মুসলমানদের সাহায্য ও রক্ষা করা মুসলমান বাদশাহদের অবশ্য কর্তব্য– এই দেশের অধিবাসিদের জন্য ও আমাকে কৃতজ্ঞ করার জন্য এবং অত্যাচারীর পীড়ন থেকে মুসলমানদের উদ্ধার করার জন্য আমি এখানে আপনার শুভাগমন প্রার্থনা করি। আপনার উপর শান্তি বর্ষিক হোক।"[৮] পাশাপাশি কুতুবুল আলম তাঁর ঘনিষ্ঠ সুফি সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীকে আরেকটি চিঠি পাঠান, যেন তিনি এ ব্যাপারে সুলতান ইবরাহিম শার্কীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। অপরদিকে সুলতান ইবরাহিম শার্কীর মান্যবর আলেম, তৎকালীন ভারতের বিখ্যাত আলেম কাজী শিহাবুদ্দীনও সুলতানকে কুতুবুল আলমের অনুরোধ মোতাবেক বাংলায় যাওয়ার পরামর্শ দেন।

এমতাবস্থায়, ইবরাহিম শার্কী সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গণেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বাংলায় আসেন। তাঁর বাংলায় আসার খবর পেয়ে গণেশ কুতুবুল আলমের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং অনুরোধ করে, সকল নির্দেশ পালন করা হবে কিন্তু সুলতানকে বাংলা ত্যাগ করতে হবে। অতঃপর কুতুবুল আলম গণেশের ছেলে যাদুকে মুসলমান বানিয়ে জালালুদ্দীন নাম দিয়ে মসনদে বসার নির্দেশ দেন। মধ্যবর্তী সময়ে কুতুবুল আলমের অনুরোধে সুলতান বাংলা ছেড়ে জৈনপুরে ফিরে যান। সুলতান জৈনপুর ফিরে যাওয়ার পর গণেশ তার ছেলেকে ক্ষমতাচ্যুত করে মসনদ দখল করে এবং আগের মতো জুলুম শুরু করে। সুলতানকে যেহেতু একবার বাংলায় এনে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে সেহেতু আর অনুরোধ করা সম্ভব হলো না।

গণেশ প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে মুসলমানদের উপর চড়াও হয় এবং বিশেষভাবে কুতুবুল আলমের পারিবারিক সদস্য ও ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে চলে যায়। একদিন তাঁর ছেলে শেখ আনোয়ার যখন গণেশের জুলুম নিয়ে অভিযোগ করছিলেন তখন কুতুবুল আলম বলেছিলেন: "মাটিতে তোমার রক্ত ঝড়লেই এই জুলুম বন্ধ হবে"[৯]। ভাবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেখ আনোয়ারকে সোনারগায়ে নির্বাসনে পাঠিয়ে যেদিন গণেশের লোকেরা হত্যা করে সেদিনই গণেশ মারা যায়। উত্তরাধিকার হিসেবে যাদু– জালালুদ্দীন মসনদে বসে কিন্তু একজন মুসলমান হিসেবে। তিনি তাঁর বাবার সকল জুলুম বন্ধ করেন, ভুক্তভোগীদের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং কুতুবুল আলমের ঘনিষ্ঠ সহযোগিদের সসম্মানে শহরে ফিরিয়ে আনেন। কুতুবুল আলমের ভাতিজা শেখ জাহিদকে সোনারগাঁ থেকে গৌড়ে ফিরিয়ে নেন

---

7. *Proceedings of the Indian History Congress* : Delhi, 1956, 216 p.

৮. *বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস সালাতীনের বঙ্গানুবাদ)* : আকবরউদ্দীন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪, ৮৮ পৃ.

৯. প্রাগুক্ত, ৯০ পৃ.

এবং তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। এভাবেই কুতুবুল আলমের ঐতিহাসিক ভূমিকার বদৌলতে মুসলমানদের অনুকূলে ফেরত যায় বাংলার মসনদ।

সুলতানী আমলে বাংলার মসনদ যখন মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিলো, যখন আবারো জালেমের খপ্পড়ে পড়েছিলো বাংলার মানুষ তখন নূর কুতুবুল আলম আর খানকায় বসে থাকলেন না। মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা ও রাষ্ট্রে ইনসাফ কায়েমের লক্ষ্যে তিনি সক্রিয় হলেন, একাধিক চ্যানেলে ক্লিক করলেন; মনোভাব তাঁর, যে কোনো মূল্যে বাংলার মানুষকে এই জুলুম থেকে রক্ষা করতে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, দীর্ঘমেয়াদে তিনি সফল হয়েছিলেন। গণেশের পুত্র যাদু, যাকে তিনি মুসলমান বানিয়ে জালালুদ্দীন নাম দিয়েছিলেন তার মাধ্যমেই বাংলার মসনদ মুসলমানদের আওতায় এসেছিলো। গণেশের জুলুম থেকে বাংলার মুসলমানদের রক্ষা করতে নিজপুত্রকে কোরবান করতেও পিছপা হননি। এতেই স্পষ্ট, বাংলার মুসলমানদের প্রতি কতটা দরদ এবং জুলুমকে হটিয়ে ইনসাফ কায়েমের লক্ষ্যে তিনি কতটা কঠোর অবস্থানে ছিলেন।

রাজনৈতিক সচেতনতা ও কার্যক্রম করতে গিয়ে আবার সাধনার পথও ভুলেননি তিনি। গণেশের রোষাণলের মধ্যে থেকেই তিনি খানকাহ, লঙ্গরখানা, মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। পুত্র শেখ আনোয়ার যখন গণেশের জুলুম নিয়ে অভিযোগ করতে এসেছিলো তখনও তিনি ছিলেন মোরাকাবায়। অর্থাৎ, জুলুমের বিরুদ্ধে তাঁর যে রাজনৈতিক অবস্থান তা তাঁকে মূল থেকে বিন্দুমাত্রও লক্ষচ্যুত করতে পারেনি। চাইলেই তিনি পারতেন বাংলার মসনদে বসতে, রাষ্ট্রনায়ক হতে, কিন্তু কখনোই চাননি। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল, বাংলার মুসলমানদের রক্ষা করা, রাষ্ট্রে ইনসাফ কায়েম করা, জুলুম থেকে বাংলার মানুষকে মুক্তি দেয়া। একজন সুফি-সাধক হিসেবে তিনি যথার্থভাবেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক জীবনধারার এই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মূল্যায়ন উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রবন্ধের ইতি টানা যায়। *বঙ্গে সূফী-প্রভাব* গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, "পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে হিন্দু জমিদার রাজা গণেশের (১৪০৯-১৪১৪ খ্রী) অভ্যুত্থানে বাঙ্গালায় যখন মুসলিম রাজত্বের ভিত্তি টলিয়া গিয়াছিল, তখন রাষ্ট্রনীতিবিশারদ কুতুব-ই-আলম এদেশে মুসলিম রাজত্বের ভিত্তি নূতন করিয়া পত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক চালবাজিতে সেইবার বাঙ্গালার মুসলমান যেরূপ আশ্চর্য্যভাবে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহার তুলনা বাঙ্গালার মুসলিম ইতিহাসে ত নাই-ই– এমনকি, ভারতীয় মুসলিম ইতিহাসেও অতি বিরল। বাঙ্গালার এই অক্লান্তকর্মী স্বধর্ম ও স্বজাতিপ্রেমিক সুফী সাধক জন্মগ্রহণ না করিলে, রাজা গণেশের অধীনে বাঙ্গালার হিন্দুদিগের যে পুনরুত্থান হয়, তাহা বাঙ্গালার নবীন জাগ্রত মুসলিম সমাজ ও সভ্যতাকে যে ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে মুছিয়া দিত, 'রিয়াদুস সালাতীন' তাহার ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিয়া এখনও বিদ্যমান আছে। এইদিক হইতে বিচার করিতে গেলে স্পষ্টই দেখা যায়, বাঙ্গালার বর্তমান মুসলিম সমাজ নূরুদ-দীন কুতুব-ই আলমের নিকট কেমন অপরিশোধ্য ঋণজালে জড়িত। কেবল স্বধর্ম ও স্বজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি স্বীয় অপমানের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন– অর্থ ও বিত্ত, পরিচারক ও অনুচারবর্গকে দস্যুবৃত্তিপরায়ণ রাজা গণেশের কোপনল-বেদীতলে বিসর্জন দিয়াছিলেন, এমনকি, স্বীয় প্রাণাধিক পুত্র শায়খ আনওয়ারকে পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয়, তিনি বাঙ্গালার অধঃপতিত মুসলিম সমাজের একমাত্র ত্রাণকর্তা, তিনিই বাঙ্গালায় ইসলাম প্রচারের প্রধান বিজয়স্তম্ভ"[১০]।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা, শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী ও নূর কুতুবুল আলম (র.) : সাধকত্রয়ের জীবন ও কর্মের উপর তুলনামূলক সমীক্ষা : মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, ঢাকা, ২০০১

২. আখবারুল আখিয়ার : আব্দুল হক দেহলভী, দিল্লি, ১৯১৩

৩. ইসলাম প্রসঙ্গ : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ঢাকা, ১৯৬৩

৪. গৌড়ে মুসলিম শাসন ও নূর কুতুব-উল-আলম : মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯১

৫. বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস সালাতীনের বঙ্গানুবাদ) : আকবরউদ্দীন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪

৬. মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, প্রথম খণ্ড : মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১ (বঙ্গে সূফী-প্রভাব)

৭. A History of Sufism in Bengal : Dr. Mohammad Enamul Hoque, Dhaka, 1975

৮. Proceedings of the Indian History Congress : Delhi, 1956

---

১০. *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড : মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১, ১০৯-১১০ পৃ. (*বঙ্গে সূফী-প্রভাব*)